Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাম্মী বেগম

রোলঃ 216021540

১৮ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাম্মী বেগম

রোলঃ 216021540

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাম্মী বেগম, আইডিঃ২১৬০২১৫৪০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শাম্মী বেগম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৮ জুন, ২০২৪ ইং

শাম্মী বেগম

আইডিঃ 216021540

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..7

নামাজের পরিচয় : 9

নামাজের ওয়াক্ত:...9

নামাজের প্রকারভেদ :...10

নামাজের নিষিদ্ধ সময়: 12

নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত:...13

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত :...13

নামাজে খুশু খুযু:..21

খুশু খুযুর ফজিলত :..22

আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায়ের ফজিলত:...22

কুরআনে নামাযের গুরুত্ব : 24

কুরআনে নামাযের আদেশ: 26

নামাজ পড়ার নির্দেশ:..30

হাদীস শরীফে নামাজের গুরুত্ব:...30

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য: 33

নামাজ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারন: 35

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:..37

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:..39

ফজিলতপূর্ণ কিছু নফল নামাজ:...41

নামাজের পুরস্কার :...44

সাহাবাদের নামাজ:..44

অতীত যামানার নেক বান্দাগণের সালাত:..47
নামাজে মনোযোগের কৌশল:..48
নামাজ গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়: 51
যে আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়:..55
নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা ও ফযীলত -১ :..56
নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় ফযীলত-২..59
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম নামাজ:..65
নামাজের অংশ সমূহের গুরুত্ব ও ফজিলত: 66
কিরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত:..67
কিয়াম বা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার ফযীলত:..68
সিজদার গুরুত্ব ও ফযীলত: 69
তাশাহুদের গুরুত্ব ও ফযীলত:..70
দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও ফযীলত:..70
মুমিনের বেঁচে থাকার স্পন্দন নামাজ : 72
জামাআতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব: 73
ফজরের নামাজের উপকিরিতা:..74
নামাজে বান্দার প্রশান্তি:..76
বিভিন্ন প্রকার সালাত:..79
জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম:..80
জুমার দিনের আদব: 81
৩.সালাতুল জানাযা..81
জানাযা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:..82
সালাতুল জানাযা আদায়ের নিয়ম:..83
৪.ঈদের নামাজ:..84
ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম:..84
ঈদের সালাতের সামাজিক প্রভাব:..85

৫.সালাতুত তারাবিহ:..........86

তারাবিহ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত: 86

৬.মাসবুকের সালাত:..........87

৭.অসুস্থ ব্যক্তির সালাত:..........89

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম: 89

৮.মুসাফিরের সালাত: 91

মুসাফিরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি:..........91

মৃত্যুর সময় রাসূল ﷺ যে কথাটি বারবরা বলছিলেন:..........92

নামাজ পরিত্যাগের বিধান..........94

নামাজ না পড়ার শাস্তি:..........97

বে নামাজির পরিনতি:: 99

বে-নামাযীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুঁশিয়ারী:..........102

বে নামাজি সম্পর্কে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের উক্তি:..........103

পরিশেষে.... 104

•

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم! وبعد:

"একজন মুসলমানের জন্য ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হচ্ছে নামায"

নামাজ কালেমা শাহাদতের স্বীকৃতির পরই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। ইমানের পরই সালাতের স্থান। মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার বিনয় ও অনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দার কাছে সালাতের হিসাব চাইবেন।

সালাত নিত্যপালনীয় একটি ফরয ইবাদাত হলেও আদর্শ জীবন গঠনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। আদর্শ জীবন বিনির্মাণে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি সালাত আদায়ের মাধমে অর্জন করা যায়। পাপাচার, অন্যায় ও অশ্লীলতামুক্ত আদর্শ জীবন গঠনে সালাত সহায়তা করে। সালাত সকল প্রকার পাপাচার ও খারাপ কাজ পরিহার করে সৎ পথে পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল-'আনকাবূত,আয়াত: ৪৫)

সালাত আমাদের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় সমাজের উচু-নিচু, ধনী- নির্ধন এবং সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় ।

সালাত আমাদের সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়। সালাতে রুকু সিজদাহ যথানিয়মে করতে হয়। এতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার শিক্ষা পাওয়া যায়। আর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সকল কাজ সঠিক সময়ে করারও শিক্ষা পাওয়া যায়। নিয়মিত সালাত আদায়কারী সাধারণত কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না।

অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে একাগ্র চিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। একাগ্রতাবিহীন সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সালাত আদায়ের সময় মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয় মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত বিনয় ও একাগ্রতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহর যে সকল বান্দা এভাবে বিনয়-নম্রতা ও বিনম্র-একাগ্রতা নিয়ে সালাত আদায় করে তাদের সফলতা অবশ্যাম্ভাবী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন –

‘অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন,যারা নিজেদের সালাতে বিনয় ও নম্র।'

(সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ১-২)

নামাজের পরিচয় :

নামাজ শব্দটি ফারসি শব্দ– এর আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘ সালাত ‘। কোরআন হাদিসে সালাত শব্দটিই ব্যবহার হয়েছে।। সালাত অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া , দোয়া করা , আল্লাহর পবিত্রতা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা ।

(সালাত) আরবি শব্দ, বহুবচনে اَلصَّلَوَات (সালাওয়াত "সালাত"-এর আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ: দোয়া, রহমত, নত হওয়া, অনুসরণ করা, উপাসনা, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায় ।

ইসলামী পরিভাষায় শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত কতিপয় আহকাম-আরকান সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাত-কে সালাত বা নামায বলে।

নামাজের ওয়াক্ত:

وَقَوْلِهِ)إِنَّ الصَلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ عَلَيْهِم(

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ ‘‘নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু’মিনদের উপর ফার্য (ফরয)।’’ (সূরাহ্ আন-নিসা ৪/১০৩)

১ ফযর, ২ যোহর, ৩ আসর, ৪ মাগরিব, ৫ ইশা

প্রতিদিন একজন মুসলিমকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়।

প্রথম ওয়াক্ত হল "ফজর নামাজ" সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এর ব্যপ্তিকাল।

এরপর "যুহর ওয়াক্ত" বেলা দ্বিপ্রহর হতে "আসর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত যার ব্যপ্তি।

তৃতীয় ওয়াক্ত "আসর ওয়াক্ত" যা সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত পড়া যায়।

চতুর্থ ওয়াক্ত হচ্ছে "মাগরিব ওয়াক্ত" যা সূর্যাস্তের ঠিক পর পরই আরম্ভ হয় এবং এর ব্যপ্তিকাল প্রায় ৩০-৪৫ মিনিট।

"মাগরিব ওয়াক্ত" এর প্রায় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পর আরম্ভ হয় "ইশা ওয়াক্ত" এবং এর ব্যপ্তি প্রায় "ফজর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত।

উপর্যুক্ত ৫ টি ফরজ নামাজ ছাড়াও ইশা'র নামাজের পরে বিতর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব।

নামাজের প্রকারভেদ :

নামাজে মহান মাবুদকে স্মরণ করা হয়, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতঅর্থে নামাজের কোনো প্রকারভেদ নেই; নামাজ নামাজই। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় শরিয়ত নামাজকে একাধিক ভাগে ভাগ করেছে। যেমন- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজ।

নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

ফরজ : ফরজ নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে। না পড়লে গুনাহ হবে। এ নামাজ আবার দুধরনের।

যথা- ১. ফরজে আইন। যা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ। ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত নামাজগুলো হলো- ফজরের নামাজ; জোহরের নামাজ; আসরের নামাজ; মাগরিবের নামাজ; এশার নামাজ ও জুমার নামাজ।

২.ফরজে কিফায়া। যা আদায় করা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ নয়। যেমন- জানাজার নামাজ।

ওয়াজিব : যে নামাজের গুরুত্ব ফরজের পরই। যেমন- দুই ঈদের নামাজ ও বিতর নামাজ হচ্ছে ওয়াজিব। কেউ ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিত না পড়লে গুনাহ হবে।

সুন্নাত : ফরজ নামাজের পাশাপাশি সুন্নাত নামাজের গুরুত্বও কম নয়। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে গুরুত্ব সহকারে সুন্নাত নামাজ আদায় করার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ অনুসরণ ও তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুন্নাত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়, কিয়ামতের দিন কারো ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহতায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ করবেন।

এ নামাজ আবার দুধরনের। যথা- ১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন। যেমন- ফজরের ফরজের পূর্বে ২ রাকাত; জোহরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত; মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাত; এশার ফরজের পরে ২ রাকাত এবং তারাবির নামাজ। ২. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। যা রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন না, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে ছেড়েও দিতেন। এ নামাজ আদায় করলে অশেষ পুণ্য লাভ করা যায়, কিন্তু কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে গুনাহ হবে না। যেমন- আসরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত এবং এশারের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত।

নফল : নফল নামাজ পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। অনেকের মতে, হাশরের মাঠে যদি ফরজ নামাজ প্রয়োজনের থেকে কম থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ ফরজের পরে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি থেকে নিয়ে সেই মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে এটা খুব একটা জরুরি মনে না হলেও প্রকৃতঅর্থে অত্যন্ত জরুরি। এ নফল নামাজই রোজ হাশরে মানুষের জন্য বেহেশত-দোযখের সিদ্ধান্তকারী হয়ে যেতে পারে। তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত, আওয়াবিন- এগুলো হলো গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ।

নামাজের নিষিদ্ধ সময়:

ইসলাম সময় ব্যবস্থাপনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলামে অনেক ইবাদাত ও আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা সরাসরি সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পালন করতে হয়। ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি এবং অপরিহার্য ইবাদাত-সালাত আদায়ের জন্যও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। মহানবি (সা.) এর হাদিসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ আদায়ের উত্তম সময় সম্পর্কে যেমন নির্দেশনা রয়েছে তেমনি নামাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে।

নামাজের নিষিদ্ধ সময় তিনটি। আর তা হলো—

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়;

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়; এবং

৩. সূর্যাস্তের সময়।

এ সময়গুলোতে সাধারণত নামাজ আদায় করা নিষেধ। তবে কোনো কারণে কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারে তবে তা আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। এ নিষিদ্ধ সময় প্রসঙ্গে সাহাবি উকবা ইবনে আমের জুহানী (রা.) বলেন, 'তিনটি সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়;যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে শুরু করে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তা হলুদাভ হওয়া থেকে শুরু করে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অস্ত যায়।' (মুসলিম)

নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত:

মুসলিম হওয়া

সাবালক হওয়া

সুস্থ মস্তিষ্কের (মানুষ) হওয়া।

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত :

নামাজ পড়া মানে মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করা। দুনিয়ার রাজা-বাদশার সামনে কথা বললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়ে থাকে! সে তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে কেমন হওয়া চাই আমাদের অবস্থা! অবশ্যই ভয়-ভীতি ও মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!' (বুখারি : ৪১৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করত তখন তিনি তাকে সর্বপ্রথম নামাযের অঙ্গীকার করাতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বের নবী-রাসূলগণও তাওহীদের পরেই নামাযের আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-'তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছিল একনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে।

(সূরা বায়্যিনাহ ৫)

একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতম

সৌন্দর্য হচ্ছে কোনো দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাত্ করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে তার প্রভুর কাছে সমর্পণ করা। আর সালাত হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর কাছে শারীরিক ও মানসিকভাবে সপে দেওয়ার সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম।

পবিত্র কোরান ও হাদিস গ্রন্থে বহু জায়গায় সালাত কায়েম করার তাগিদ ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু’মিনদের উপর ফরয।

(সুরাহ আন-নিসা, ১০৩)

আল্লাহ সালাতকে ফরয করে দিয়েছেন বিধায় কোনো অবস্থাতেই বিনা ওযরে (ইচ্ছা করে) সালাত ছাড়া যাবে না। (ইসলামিক পরিভাষায় ‘ফরয’ মানে হচ্ছে অবশ্য করণীয়)।

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আরো বলেন, “তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হও এবং তাকে ভয় কর আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ”

(সুরাহ আর-রুম, ৩১)

সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, তাই সালাত আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য একটি সুন্দর ইবাদাত। একাগ্র মনে সালাত আদায়কারী নিজের ও সমাজের কল্যান ব্যতিত কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। এছাড়া সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

নামাজ প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ (বাধ্যতামূলক)। নামাজ ছাড়া ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অসম্ভব। নামাজ পাপাচার থেকে মুক্ত রাখে। স্বচ্ছ, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময়

জীবন লাভ হয়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

একজন কাফের ও ঈমানদারের সর্বপ্রথম পার্থক্য হলো নামাজ । নামাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আল্লাহর প্রতি অনুগত হিসেবে প্রকাশ করে । নবি (স .) বলেছেন- ' নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় । '

আর সালাতে অলসতাকারীদের মধ্যে শ্রেণিভেদ রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন যে সে কখনও সালাত আদায় করে না, এটি হলো কুফুরী। তাদের মধ্যে কেউ সালাতের ব্যাপারে অলসতাকারী।

নামাযের অগণিত ফযীলতের মধ্যে একটি হচ্ছে নামায মানুষকে অন্যায় ও গুনাহ থেকে রক্ষা করে। ইরশাদ হয়েছে-'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

এখানে প্রশ্ন হয়ে থাকে, নামায তো আমাদের গুনাহ থেকে হেফাযত করে না? এর উত্তর উক্ত আয়াতের মধ্যেই রয়েছে। বলা হয়েছে যে, 'অবশ্যই আল্লাহর যিকর (স্মরণ) সবচেয়ে বড়'। এ অংশে আল্লাহ তাআলা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রকৃত রহস্য বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরতকারী হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। যার নামাযে আল্লাহর স্মরণ যত বেশি হবে নামায তাকে তত বেশি গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের নামায সম্পর্কে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের নামাযের প্রকৃত অবস্থা নিজেরাই অনুধাবন করতে সক্ষম হব। আমাদের তো গাফলতের কারণে এমনই অবস্থা যে, অনেক সময় নামাযের শেষে মনেও করতে পারি না যে, কোন কোন সূরা পড়েছি। আর মোটামুটি খেয়াল করে নামায পড়লেও আমরা কি খেয়াল করি যে, আমার রবের সাথে আমার কী কী কথোপকথন হল? এগুলো চিন্তা করলেই আমরা বুঝে যাব এই ফযীলত লাভের আমরা কতটুকু হক্বদার।

নামাযের ফযীলত সংক্রান্ত বহু হাদীস বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল:

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কি বলতে পার যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ঠিক এমনই। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা গুনাহসমূহ ধুয়ে মুছে ছাফ করে দেন।' (সহীহ বুখারী ১/৭৬)

হযরত উছমান রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় তখন যে মুসলিম সুন্দরভাবে অযু করে খুশু-খুযূর সাথে উত্তমরূপে নামায আদায় করে, তার কবীরা গুনাহ ছাড়া পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর এ রকম সর্বদাই চলতে থাকে। (সহীহ মুসলিম ১/১২১)

অর্থাৎ প্রতি নামাযেই এভাবে গুনাহ মাফ হতে থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ মধ্যবর্তী সময়ের জন্য গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ সংঘটিত না হয়।' (সহীহ মুসলিম ১/১২২)

হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে একবার বের হলেন। ঐ সময় গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছ থেকে দুটি ডাল নিয়ে সেগুলো নাড়া দিয়ে পাতা ফেলতে থাকেন এবং বললেন, আবু যর! আমি বললাম, লাববাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে তখন তার গুনাহগুলো এভাবে ঝরে যায় যেমন এই গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে। (মুসনাদে আহমদ ৫/১৭৯)

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد حاب وخسر.

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي ابن خلف .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কাড়ুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। —মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت علي أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। ‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই। (ইবনে মাজাহ ৪৩০)

কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাত উঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি, কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহূর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখন সবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবে একদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের দিন ঐ বেনামজীর দল ধরা খেয়ে যাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেন, ৬৮: আল-ক্বলম,:আয়াত: ৪২,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না।

(সূরা কলম আয়াত: ৪২)

وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون ঐসব লোককে নামাজের জন্য (দৈনিক পাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও নামাজে আসত না।

(সূরা কলম ৪৩)

ঐ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো কোন ভালো মানুষ আসেনা।

ما سلككم في سقر

তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজির দল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা।

(সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ارءيتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّآت هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সবাই বল্ল না, তার শরীরে কোন প্রলার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।

إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب" ِ

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।

যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)।

وعن أبي ذر أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ...رَوَاهُ أَحْمَد

আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। হযরত আবু যর রাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে,তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ, সহীহ)।

নামাজে খুশু খুযু:

খুশু-খুযু কি? খুশু আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ- বিনয় ও নম্রতা। পরিভাষায় 'খুশু' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। ১. বিনয় ও নম্রতা; ২. শান্তি ও স্থিরতা। অন্তরে খুশু বলতে এই উভয় অর্থকেই বোঝায়। সালাতের মধ্যে খুশু থেকে উদ্দেশ্য অন্তরের ওই অবস্থাদ্বয়, যা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রসারিত হয় এবং তাতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েও শান্ত ও বিনয়ীভাব প্রকাশ পায়। সালাতে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয়-ভীতি ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় এর আদ্যোপান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে খুশুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খুশু হচ্ছে সালাতের প্রাণ ও সালাতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। খুশুবিহীন সালাতের দৃষ্টান্ত মৃত লাশের মতো, যার কোনো প্রাণ নেই। সত্যিকারার্থে যারা খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায় করে, কুরআন-সুন্নাহতে তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট ফজিলত বর্ণিত রয়েছে।

খুশু' এর প্রায় সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে খুযু। তবে উভয় শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। তা হচ্ছে, খুশু মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা এবং তা এরূপ বিনয় প্রকাশার্থে ব্যবহার হরা হয়, যা কৃত্রিম নয়; বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতি স্বরূপ হবে। আর 'খুজু' শব্দটি দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় এবং নম্রতাকে বোঝায়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন- 'এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।' (সূরা আল-বাকারা-২৩৮) এখানে আল্লাহর জন্য দাঁড়ানো বলতে সালাতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে, বিনীত হওয়া বলতে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। কেননা সালাত মানেই আল্লাহর সাথে কথা বলা আর আমরা যার সাথে কথা বলি নিশ্চয়ই তার দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়েই কথা বলি, যদি এমন হয় যে যার সাথে কথা বলছি তাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি না তাহলে নিশ্চয়ই তিনিও আমাদের গুরুত্ব দেবেন না এটিই স্বাভাবিক।

খুশু খুযুর ফজিলত :

কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাজে বিনয় নম্র।' (সূরা মুমিনুন : ১-২) হাফেজ ইবনে কাছির রহ: দ্বিতীয় আয়াতের তাফসিরে লিখেন, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং স্থিরতার সাথে নামাজ আদায় করে, তারাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। আর 'খুশু' অর্থ শান্তময়িতা, স্থিরতা ও নম্রতা। যা আল্লাহর ভয় ও তাঁর মুরাকাবার কারণে অন্তর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রকাশ পায়, এর নামই হচ্ছে খুশু। (তাফসিরে ইবনে কাছির, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৭

আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায়ের ফজিলত:

আল্লাহ সুবহানাতা'আলা নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত ফরয করা হয়েছে' (নিসা ১০৩)।

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ فِىْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

উম্মু ফারওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্ আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা।[1]

عَنِ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنِّىْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِى.

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছি, আর একটি অঙ্গীকার করেছি

যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে আদায় করে উপস্থিত হবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য আমার কোন অঙ্গীকার নেই।[2] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীস উপমহাদেশীয় ছাপা আবু দাঊদে নেই।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِى الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে অচিরেই দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং সূর্যোদয়ের পূর্বের নামাজ ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামাজের প্রতি যত্নশীল হও। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন, ‘সুতরাং তোমরা প্রতিপালকের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্য ডুবার পরে’।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِىْ وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِىْ فِيْهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِىْ بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّىْ فَقَالَ حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ফাযালা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দান করেন। তার মধ্যে রয়েছে, তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হও। আমি বললাম, এই সময়গুলো আমার জন্য খুব

ব্যস্ততার। সুতরাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাকে নির্দেশ দিন। যখন আমি তা পালন করব, তখন যেন আমার জন্য তা যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন, তুমি দুই আসরকে যথাযথভাবে আদায় কর। এই ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম, দুই আসর কী? তিনি বললেন, সূর্য উঠার পূর্বের নামাজ এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামাজ।

কুরআনে নামাযের গুরুত্ব :

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরীয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য, প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

নামাজ আদায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা বালেগ-বালেগা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ নামাজ আদায়ে আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী কল্যাণও আছে।

(ক) কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে.......

(১) "নামাযীরা পাবে জান্নাতে সম্মানজনক আসন যারা নিজেদের সালাত হেফাযত করে, (পরকালে) তারা (অতীব) মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।" (সূরা ৭০; মা'আরিজ ৩৪৩৫)।

(২) সালাতের কারণে অপরাধ থেকে আল্লাহ নিজেই তাদেরকে হেফাযতে রাখেন। "নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা ২৯; আনকাবুত ৪৫)

(৩) সালাত আদায়কারীরা সফলতা লাভ করে ফেলেছে, "ঐসব মুমিন বান্দারা নিশ্চিত সফলতা লাভ করে ফেলেছে, যারা তাদের সালাতে (খুশু-খুযূ ও) বিনয়াবনত থাকে"

(সূরা ২৩; মুমিনূন ১-২)। এখানের আয়াতে 'ফালাহ' শব্দের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বুঝানো হয়েছে।

(৪) সালাত হলো এক উত্তম যিকির।আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। "যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।" (সূরা ১৩; রা'দ ২৮)

(৫) ইহ ও পরকালের কাজকর্মের সহায়ক হলো সালাত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে বলেছেন, "(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা!) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও।" (সূরা ২; বাকারা ৪৫)।

এ জন্য যখন কোন সমস্যা আসতো বা বড় বড় কাজ আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

(৬) এ আমলের মধ্যে রুযী-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ। "তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো।"

(সূরা ২০; ত্বা-হা ১৩২)

(৭) ঈমান ও কাজকর্মে দৃঢ়তা এনে দেয় সালাত।

"(আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীরু জীব হিসেবে, যখন তার ওপর কোন বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা সালাত আদায় করে। যারা নিজেদের সালাতে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে।" (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৯-২৩)

আমরা যদি এ আলোকগ্রন্থ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে আমরা কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

কুরআনে নামাযের আদেশ:

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।

সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী

হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।

সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি রাসূল ﷺ নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।

সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

রাসূল ﷺ কে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।– সূরা হূদ (১১) : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

أُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।

সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِیْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।-সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের

গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

নামাজ পড়ার নির্দেশ:

আমর ইবনে শুয়াইবের দ্বারা তার পিতা হতে বর্ণিত, তার দাদা বলেছেনঃ আল্লাহর রাসূল বলেছেনঃ তোমাদের শিশুদেরকে সাত বছর বয়সে (ফরজ) নামাজের নির্দেশ দাও, আর দশ বছর বয়স থেকে তাদের প্রহার কর যদি তারা তা না করে, আর তাদেরকে নিজ নিজ বিছানায় আলাদা করে দাও।"

আবু দাউদ (৪৯৫

হাদীস শরীফে নামাজের গুরুত্ব:

(১) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

(বুখারী: ৫২৮)

(২) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়।

(মুসলিম: ২৩৩)

(৩) কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়।

(সহীহ তারগীব: ৩৫৬)

(৪) যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে।বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না।

(সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

(৫) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)

(৬) সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।

(৭) যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(৮) জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)

(৯) নবী (স) তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে (সালাতের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদ দাও। (সহীহ তারগীব: ৩১০) (১০)

যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করে তাহলে তার নাম ইল্লিয়্যিনে লেখা হয়।

(সহীহ তারগীব: ৩১৫)

(১১) যে লোক এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকে যেন তার কলব মসজিদের সাথে ঝুলে আছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দেবেন।

(বুখারী: ৬৬০)

(১২) মসজিদ হলো প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ লোকের ঘর। যে ব্যক্তির ঘর হবে মসজিদ, সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে আরাম, দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের পথে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পুলসিরাত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন (সহীহ তারগীব: ৩২৫)।

(১৩) ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের ফযীলত দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম (মুসলিম)।

(১৪) যেসব লোককে জান্নাতে নেবেন বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নামাযীরা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।(আবু দাউদ)

(১৫) সালাত কিয়ামতের দিন বান্দার ঈমানের দলীল হয়ে যাবে। বান্দা তখন তার সামনে নূর ও জ্যোতি দেখতে পাবে।

১৬) সালাতে সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহর একদম কাছে চলে যায়।(মুসলিম)।

(১৭) সালাত হলো বান্দার মন্দ কাজের কাফফারা যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (মুসলিম)

(১৮) সালাত আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হিসেবে গৃহীত।(বুখারী)

(১৯) সালাত হলো নয়ন জুড়ানো ও চক্ষু শীতলকারী ইবাদত। (নাসাঈ)

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য:

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান ও আমলের মাঝেই যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। ইসলামে এমন কোন আমল নেই যা মুসলমানের জন্য পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। এই পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে 'কালেমা' যার মাধ্যমে মানুষ স্বীকারে করে নেয় যে তার প্রভূ একমাত্র আল্লাহ। কালেমার পরই নামাজ অন্যতম একটি স্তম্ব এবং ইসলামে নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'আমি জ্বিন জাতি ও মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।' (সুরা যারিয়াত : ৫৬)।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে নামাজ এবং রোজা ধনী, দরিদ্র সকলের জন্যই ফরজ। তবে হজ্জ এবং যাকাতের বিধান শুধুমাত্র ধনী ব্যাক্তিদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরজ রোজা ভঙ্গ করার হুকুম রয়েছে এবং পরে তা আদায় করে নেওয়া যায়। রোজা ভঙ্গের পর অক্ষম ব্যাক্তি ফকির, মিসকিনকে পেট ভরে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে রোজার কাফফারা আদায় করতে পারবেন এইরকম বিধানও ইসলামে রয়েছে। তবে নামাজের ক্ষেত্রে কাযা করার হুকুম শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে এবং নামাজের কোন কাফফারা বা বদলা হয় না। বলা হয়েছে যদি পানির অভাবে নামাজ কাযা হবার সম্ভবনা থাকে তবে সে যেন তাইমুম করে নামাজ আদায় করে। যদি কোন ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে সে যেন বসে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। যদি কারো বসে বসে নামাজ পড়তেও কষ্টকর হয়ে পড়ে তারপরেও সে যেন শুয়ে নামাজ আদায় করে। এমনকি চোখের ইশারায় নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে।

দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য নামাজ না পড়ার বা বাদ দেওয়ার বিধান নেই। জ্ঞানসম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও কিছু নিয়মনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। ইসলামে

নামাজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যা পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জন্য ফরজ। প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ঈমানের গ্রহণের পর প্রথম এবং প্রধান ইবাদত নামাজ। নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথা সময়ে নামাজ আদায় করাও জরুরি। কেননা পরকালে সকল মুসলমানদের কাছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তাঁর পরবর্তী সকল হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

নামাজ আদায়ের সময় তা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। নামাজ আদায়ে দায়সারা ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। নামাজের সবগুলো বিধান মেনে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রেখে পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সেসব মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়াবনত থাকে।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২)।

সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপারে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন, 'যখন তুমি নামাজে দন্ডায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।' -(ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ৫২২৬)।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি অর্থ্যাৎ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।

নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। প্রতিদিন সিজদা দিয়ে বান্দা এটিই প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করে না। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য

হচ্ছে কোন দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাৎ করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমীমগণ তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।'

নামাজের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে নামাজের সময় সকলেই সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। এক কাতারে যেমন গরিব ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পরনে জীর্ণ শীর্ণ ছেড়া কাপড় ঠিক একই নামাজের কাতারে একজন ধনী ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পড়নে দামী কাপড় ও সুগন্ধি।

শুধু ধনী গরিব নয় ছোট-বড়, বন্ধু-শত্রু, উর্ধ্বতন কর্মকতা - নিম্নতম কর্মচারী, ফকির-বাদশা মোটকথা সকল মুসলিম সব বিভেদ ভুলে গিয়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিতে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। সকলেই আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে প্রকাশ্যে মাথা নত করে। এটিই নামাজের আসল সৌন্দর্যের প্রতিফলন। নামায সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং বেহেস্তের চাবিকাঠি। আর তাই এজন্যই বলা যায়, নামাজ হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

নামাজ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারন:

নামাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫)

'যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আমি এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না' (সূরা আরাফ, আয়াত-১৭০)।

'মুমিনরা নামাজ আদায় করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন' (সূরা তাওবা, আয়াত-৭১)।

মানুষের জীবনে কোনো বিপদ-আপদ এলে একজন প্রকৃত মুমিন বান্দার উচিত ধৈর্য্য ধারণ করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং অবশ্যই তা নামাজের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাজের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন' (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩)।

'অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামাজ পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে' (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৯)।

'নামাজ কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে' (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-৭২)।

'বলো, আমার নামাজ, আমার ইবাদতের সমস্ত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য' (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-১৬৩

)। 'আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ কায়েম করো' (সূরা ত্বহা, আয়াত-১৪।

নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রাসূল সা: বলেছেন 'নামাজ বেহেশতের চাবি'। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তার বান্দার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আর এ জন্যই একজন মুসলিমের জীবনে নামাজের গুরুত্ব অনেক, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় ইবাদত হলো নামাজ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা:কে জিজ্ঞাসা করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'নামাজ'। (বুখারি ও মুসলিম)

নামাজ এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে কুফর এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কোন ব্যক্তি ইমানদার আর কোন ব্যক্তি কাফির তার স্পষ্টত ফারাক হলো নামাজ। কারণ মুমিন ব্যক্তি যেকোনো অবস্থাতেই প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ আদায় করবে, আর কাফির ব্যক্তি নামাজ থেকে দূরে থাকে।

এ সম্পর্কে জাবির রা: বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সা: নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কুফর ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।' (সুনানে তিরমিজি-২৬১৮, সহিহ ইবনে মাজাহ-১০৭৮, মুসলিম)

হুসায়ন ইবনে হুরায়স রহ. বুরায়দা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিলো সে কুফরি করল।' (সুনানে নাসায়ি-৪৬৪, সহিহ ইবনে মাজাহ-১০৭৯)

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগে-পরে ১২ রাকাত সুন্নত নামাজ রয়েছে, যার গুরুত্ব অপরিসীম। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নত বলা হয়, ওই আদেশমূলক বিধানকে, যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য না হলেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়মিত আমল থেকে তা প্রমাণিত। -(ফিকহুস সুন্নাহ, ১৬০)

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কারও ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ করবেন।

সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরজ নামাজে কোনও কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোনও নফল (নামাজ) আছে কি না।' অতএব তার নফল নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অন্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।' -(সুনানে আবু দাউদ, ৭৭০, তিরমিজি, ৩৩৭, ইবনে মাজাহ, ১১৭)

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলো, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজ নামাজের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পর দুই রাকাত, ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত। -(তিরমিজি, কিতাবুস সালাত, ১/ ৪৪০,৪৪৫)

আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিন-রাতে ১২ রাকাত নামাজ পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; জোহরের (ফরজ নামাজের) আগে চার রোাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত।'-(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৫৭৭)

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

নফল আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক ও অতিরিক্ত। ইসলামের পরিভাষায়, ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলামী শরিয়ত প্রবর্তিত বিধান বা বিষয়কে নফল বলা হয়। (মুজামুত তারিফাত, পৃ. ২৬৬)

যে আমল রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত করতেন এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন তাকে মুস্তাহাব, নফল বা মানদুব বলা হয়।

নফল নামাজের দ্বারা মূলত আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বতের পরিমাপ করা হয়। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ভালোবাসার বিষয়টি যাচাই হয়। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে এভাবে বোঝানো যায় যে, মালিকের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের দৈনিক কাজের রুটিন ঠিক করে দেওয়া হয়; যা তাকে অবশ্যই করতে হবে। আর মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ফরজ।

নফল আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক ও অতিরিক্ত। ইসলামের পরিভাষায়, ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলামী শরিয়ত প্রবর্তিত বিধান বা বিষয়কে নফল বলা হয়।

(মুজামুত তারিফাত, পৃ. ২৬৬)

যে আমল রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত করতেন এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন তাকে মুস্তাহাব, নফল বা মানদুব বলা হয়।

এমন বিধানের ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। এর ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না। যথা তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল সদকা, নফল হজ ইত্যাদি।

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম।

নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো—

ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ : হাশরের ময়দানে ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয়, তাহলে সে সফল হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যদি ফরজ সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহলে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না? তখন নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্য আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ৪১৩)

আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : নফল সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয় বান্দার সঙ্গে শত্রুতা করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরজ করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নেই।

বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। (বুখারি, হাদিস : ৬৫০২)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য : জান্নাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে, যারা অধিক হারে নফল সালাত আদায় করবে। রবিআ বিন কাব (রা.) বলেন, আমি রাতের বেলা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম এবং অজুর পানিসহ অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বলেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বলেন, এ ছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বলেন, তুমি বেশি বেশি সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করো। (মুসলিম, হাদিস : ৯৮১)

ফজিলতপূর্ণ কিছু নফল নামাজ:

নিম্নে কিছু নফল সালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

তাহাজ্জুদ :

ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। পবিত্র কোরআনে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।’ (সুরা : সিজদা, আয়াত : ১৬)

মধ্য রাতের পর বা শেষ রাতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তাহাজ্জুত সালাত দুই থেকে আট রাকাত পড়া যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ। (মুসলিম, হাদিস : ১১৬৩)

ইশরাক : ইশরাক : সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন। এ সময় দোয়া, তাসবিহ পাঠ ও দ্বিনি আলোচনা করতেন।

সূর্যোদয়ের পর তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এই আমলের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করল এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে বসে থাকল; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করল, সে একটি পরিপূর্ণ হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাবে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৫৮৬)

দুহা : সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার আগমুহূর্তে 'দুহা'র নামাজ আদায় করা হয়। অনেক আলেমের মতে, ইশরাক ও দুহা পৃথক নামাজ। কেউ কেউ বলেছেন, সময়ের শুরুতে আদায় করলে সেটা ইশরাক আর সময়ের শেষে আদায় করলে দুহা। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, দুহার নামাজ ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮)

আউয়াবিন : মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়কৃত ছয় রাকাত নামাজ 'আউয়াবিন' নামে পরিচিত। আল্লামা মাওয়ার্দি এই অভিমত প্রাধান্য দিয়েছেন।

(মুগনির মুহতাজ : ১/৩৪৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং এগুলোর মধ্যে কোনো মন্দ কথা না বলে, তার আমলনামায় ১২ বছর ইবাদতের সওয়াব লেখা হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১১৬৭)

তাহিয়্যাতুল অজু : অজুর মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুই রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল অজু। নিষিদ্ধ

সময়ের বাইরে যেকোনো সময় এই নামাজ আদায়ের অবকাশ আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি

উত্তমরূপে অজু করল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৪)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করার পর আদায় করার নামাজ। নিষিদ্ধ সময় ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যায়। তবে নামাজের জামাত ও ওয়াক্তের নির্ধারিত সুন্নত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর বসে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : **১১৬৭**)

তাওবার নামাজ : তাওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যে সালাত আদায় করা হয় তাকে সালাতুত তাওবা বলা হয়। আবু বকর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ করে, অতঃপর উঠে দাঁড়ায় এবং পবিত্রতা অর্জন করে আর দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনু মাজাহ, হাদিস : **১৩৯৫**)

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সালাত : সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহর বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) সফর থেকে ফিরে সাধারণত প্রথমে মসজিদে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে তারপর বাড়িতে প্রবেশ করতেন।

(বুখারি, হাদিস : ৪৪৩, ৪৬৭৭)

নামাজের পুরষ্কার :

নামাজিদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হলো-তাদেরকে নিজের নৈকট্য প্রদান। পবিত্র কোরআনের সূরা আলাকে আল্লাহতায়ালা নবী করিমকে (সা.) তার (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য নামাজ ও সিজদা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর নেয়ামতগুলোর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ একটি তুলনাহীন ও অমূল্য নেয়ামত।

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন যে: আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তার উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক), বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীর ধরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর জন্য জামাতে (৫ ওয়াক্ত ফরজ) নামায আদায় করে, তার জন্য দু'টি নাজাত লেখা হয়ঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।

—জামে আত-তিরমিযী ২৪১, সহীহা ১৯৭৯, সহীহ আত-তারগীব ৪০৯, সহীহ আল-জামি' ৬৩৬৫

সাহাবাদের নামাজ:

সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে নামাজ আদায়ের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের উপায় শিখেছিলেন। ঘরে, বাইরে, যুদ্ধের ময়দানে সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দিয়েছেন তারা। এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন।

হজরত তালহা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। একবার নামাজের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি হওয়ায় তিনি তার প্রিয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করে

দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আবু তালহা আনসারী (রা.) একবার তার এক বাগানে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখি উড়তে শুরু করল (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না), তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব ভালো লাগল। ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। তারপর আবার নামাজের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতে পারছিলেন না, নামাজ কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এ সম্পদ যেন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে!

হজরত তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যে সম্পদ আমার নামাজের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২১৪)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হজরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন আমাদের এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ওই মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কোনো সঙ্গীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষ্যান্ত হব না। তখন সে নবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নবী (সা.) এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাকবে। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে মুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী সাহাবি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ে মশগুল হয়ে পড়েন। এমন সময় ওই লোকটি এসে দূর থেকেই আনসারী সাহাবিকে দেখে

চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার শরীরে এসে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। মুশরিক ব্যক্তি একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তিনি রুকু সিজদা করে (যথারীতি নামাজ শেষ করে) সঙ্গীকে জাগালেন।

মুহাজির সাহাবি জেগে উঠে তার রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাজে) এমন একটি সুরা তেলাওয়াত করছিলাম যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি।' (আবু দাউদ : ১৯৮)

সাহাবায়ে কেরামের নামাজের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের নামাজ ছিল সত্যিকার অর্থেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আমাদের নামাজও যেন হয় এমন খুশু-খুজুর অনুভূতিতে পূর্ণ। যারা এমন নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন 'সফলকাম ওইসব মুমিন, যারা তাদের নামাজে খুশুখুজু (পূর্ণ মনোযোগ) অবলম্বন করে।' (সুরা মুমিনুন : ১-২)

নামাজে দাঁড়িয়ে মুসল্লিরা মূলত মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথন করেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!' (বোখারি : ৪১৩)।

আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে কতটা ভয় ও মনোযোগী হওয়ার দরকার নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারেন! সাধারণ দুনিয়ার রাজা-বাদশার সামনে কথা বললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়! সে তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা- আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া চাই! অবশ্যই মনোযোগের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। তাঁর প্রতি মনোনিবেশ রাখতে হবে।

অতীত যামানার নেক বান্দাগণের সালাত:

অতীত যামানার নেক বান্দাগণ কতটুক মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করতেন? তা আলোচনা করা হলো....

(১) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র) চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার ফজরের নামাযের কোন দিন জামাআত ছুটেনি।

(২) ওয়াকী ইবনে জাররাহ বলেন, আমাদের বয়স যখন প্রায় সত্তর বছর, তখনও তার সালাতে কখনো তাকবীরে উলা' ছুটেনি। তাকবীরে উলা' হলো জামাআতে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব 'প্রথম যে তাকবীরটি' দেয়।

(৩) আলী ইবনে হুসাইন বিন যাইনুল আবেদীন যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যেত। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি জান না যে, আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই? এবং কার সাথে কথাোপকথন করি? আরেকবার তাঁর নামাযে সিজদারত অবস্থায় তার বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল। এমন সময় সিজদা থেকে মাথা উঠালেন যখন আগুন নিভে গিয়েছিল। বিষয়টি তাকে বলা হলে তিনি বলেন, আরেকটি আগুন আমাকে এ আগুন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল।

(৪) মুসলিম ইবনে ইয়াসার আল-বাসারী যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন মনে হতো এক খণ্ড কাঠ দাঁড়ানো আছে। সামান্যতম কোন নড়াচড়া ছিল না। নামায শুরুর সময় তার পরিবারের লোকদেরকে বলতেন তোমরা তোমাদের কথাবার্তা বল। আমি এখন তোমাদের কথা শুনি। কেননা, নামাযে তিনি তখন আল্লাহর সাথে কথাবার্তায় মগ্ন।

(৫) আমাশ বলেন, ‘ইবরাহীম আত্-তাইমী যখন সিজদা করতেন তখন মনে হতো তিনি যেন একটা দেয়ালের অংশ। এ অবস্থায় চড়ুইপাখি তার পিঠে এসে বসে যেতো।

(৬) ইয়াকুব ইবনে ইয়াজীদ বাসরীর নামাযরত অবস্থায় একবার তার কাঁধ থেকে চাদর চুরি হয়ে যায় এবং পরে আবার তাকে তা ফেরতও দেওয়া হয়। কিন্তু নামাযে গভীর মনোযোগ থাকার কারণে তিনি তা টের করতে পারেননি।

(৭) মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন নাসের মারওয়াবীকে তার নামাযরত অবস্থায় দেখেছি, তার কানে মাছি বসেছে, আর রক্ত বয়ে যাচ্ছে। তবুও তিনি মাছি সরাতেন না। এমন খুশূ-খুযূ ও মনোযোগ ছিল তাদের নামাযে।

নামাজে মনোযোগের কৌশল:

দৈনন্দিন জীবনে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিঘ্নতা, অলসতা ও নানা ধরনের চিন্তার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। এর প্রধান কারণ হলো সালাতে একনিষ্ঠতা, মনোযোগ না থাকা।

একনিষ্ঠ ছাড়া সালাত কখনো আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা একনিষ্ঠতার সঙ্গে আমার ইবাদত কর। (সুরা বাইয়্যিনা-৫)

সালাতে পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ সাধনের কিছু কৌশল:

প্রথম কৌশল হলো, অন্তরের মধ্যে এই অনুভব করা এটা শেষ নামাজ। মৃত্যু এমন একটি বিষয়ের যা কখন আসে বলা যায় না।

দুনিয়া এখন গ্লোবাল ভিলেজের মাধ্যমে হাতের মুঠোয়, কিন্তু মৃত্যু এর বাহিরের একটি অজানা-অধরা বিষয়।

সালাতে যখন দাঁড়াবে তখন এটা অনুভব করতে হবে এটাই বিদায়ী নামাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াও তখন তুমি বিদায়ী সালাত পড়। (মুসনাদে আহমদ)। হতে পারে এটি জীবনের শেষ নামাজ।

সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির দ্বিতীয় কৌশল হলো, এ অনুভব করা সালাত হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার কথোপকথনের মাধ্যম।

সালাতের মাধ্যমে গোলাম ও মনিবের মাঝে কথা বলা যায়। যদিও সেটা আমাদের শ্রবণ হয় না, তবুও এ মনোভাব ধারণ করতে হবে অন্তর দ্বারা আমরা কথা বলছি।

আল্লাহতায়ালা বলেন, বান্দা যখন নামাজ পড়ে তখন তা আমি আধা-আধি ভাগ করি এবং তার কথার উত্তর দিয়ে থাকি। (বুখারী)

বান্দা যখন বলে, সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এই বিশ্বজগতের মালিক। তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা আদায় করেছে।

এভাবে প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে থাকেন। এই অনুভবটা অন্তরের মাধ্যে লালন করতে পারলে নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধি হবে।

সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির তৃতীয় কৌশল হলো, ধীরস্থির হয়ে সালাত আদায় করা। সালাত মুমিন জীবনে সবরের (ধৈর্য) শিক্ষা দেয়।

সালাত নম্র-ভদ্র হয়ে বিনয়ের সাথে আদায় করতে হয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, মুমিনরা তাদের সালাতে বিনয়ী অবলম্বন করে। (সুরা মুমিনুন-০২)

যত্নসহকারে সালাত আদায় না করলে সালাতে মনোযোগ সাধন হবে না। কেরাত, রুকু ও সেজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর ওই ব্যক্তি যে, ধীরস্থিরভাবে নামাজ পড়ে না ও রুকু সেজদায় দেরি করে না। (তীবরানি)

তাসবিহ তাহলিলগুলো অর্থসহ জানার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করতে হবে; যার ফলে মনোযোগ অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ার সুযোগ থাকবে না।

সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির চতুর্থ কৌশল হলো এ অনুভব করা- আমি আল্লাহর সঙ্গে দেখা করছি।

আল্লাহতায়ালা সার্বক্ষণিক আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন কিন্তু দুনিয়ার কোনো চর্মচক্ষু দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না।

সালাতের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি যেন তোমাকে দেখছেন। (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহর সামনে যখন মাথানত করতে হয় তখন এই ভয়ে করতে হবে তিনি যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

পৃথিবীর সব চোখ এড়ানো যায় কিন্তু আল্লাহর চোখ কখনো এড়ানো সম্ভব নয়। বান্দা যখন সেজদা দেয় তখন আল্লাহর কুদরতি পায়ের উপরে সিজদা দেয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে খুবই সজাগ থাকতে হবে। এই অনুভব লালন করতে পারলে ভয় বৃদ্ধি পাবে ও পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ সাধন হবে।

সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির সর্বশেষ কৌশল হলো- পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

পূর্ববর্তী হলো- সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেইন ও বিশিষ্ট ইসলামী স্কলাররা। কারণ তারা সর্বত্র আল্লাহকে বেশি ভয় করে এবং তাদের মতের ভিত্তিতে অসংখ্য মাসয়ালার সমাধান হয়ে থাকে।

নামাজ গোনাহ্ মার্জনার অন্যতম উপায়:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

“যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন: না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।

নামাযের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। মাসায়িল মোতাবেক নামাযের রোকনগুলো আদায় করার পাশাপাশি অন্তরের ইখলাস ও খুশু-খুযূ এবং নামাযের প্রতি মুহাববত নামাযের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপরিহার্য। এই পূর্ণাঙ্গ নামাযের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির নিকটতম সম্পর্ক তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত লাভের এবং প্রেমাষ্পদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কথোপকথনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম নামায।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়।’ (সূরা ত্বহা : ১৪)

এক হাদীসে কুদসী থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত সবচেয়ে বেশি নামাযের মাধ্যমে, বিশেষত নফল নামাযের দ্বারা অর্জিত হয়। এজন্য নামায

সঠিকভাবে আদায়ের সাথে সাথে অন্তরে নামাযের প্রতি মুহাববত ও ভালবাসা তৈরি করা জরুরি। নামাযের প্রতি মুহাববতের কারণেই আল্লাহর প্রকৃত নেক বান্দাগণ যখন নামাযে দাড়ান তখন তাদের দিলের সব অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর হয়ে যায়। হৃদয় ও মন শান্ত ও প্রশান্ত হয়। দিলে সুকূন ও সাকীনা অনুভব করেন। অপরদিকে কোনো কারণে নামায আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা কোনো অসুবিধা হলে তারা অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি বলেছেন- নামাযে আমার চোখের শীতলতা।

অন্য এক হাদীসে হযরত বেলাল রা.কে আদেশ করেছেন, 'হে বেলাল! নামায কায়েম করে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও।' (সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নফল নামাযে দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন। কখনও কখনও প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল ইমরান, তৃতীয় রাকাতে সূরা নিসা এবং চতূর্থ রাকাতে সূরা মায়িদা পড়তেন। তিলাওয়াত করতেন তারতীলের সাথে। রহমতের আয়াত এলে থেমে রহমতের জন্য দুআ করতেন, আযাব ও শাস্তির আয়াতে পৌঁছলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে যেত, কিন্তু তিনি নামাযের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই হত না।

তদ্রূপ নামায পড়ায় ব্যঘাত সৃষ্টি হলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন।

মক্কার লোকদের সাড়া না পেয়ে অনেক আশা নিয়ে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গেলেন তখন তারা মক্কাবাসীদের চেয়েও অধিক নির্দয়তার পরিচয় দিল এবং কুরায়েশদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাল। নবীজী যখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসছিলেন তখন তারা দুষ্কৃতিকারী ও বদমাশদের লেলিয়ে দিল। তারা পাথর ছুড়ে ছুড়ে নবীজীর দেহ মুবারক রক্তাক্ত করে ফেলল। সেই সঙ্গীন মুহূর্তেও দয়ার নবী

তাদের জন্য কোনো বদদুআ করেননি; বরং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এরা আমাকে চিনতে পারেনি, আমার দাওয়াত বুঝতে পারেনি। এদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আমার ডাকে সাড়া দিবে, আমার দাওয়াত কবুল করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে যখন তাঁর আসরের নামায কাযা হয়ে গেল, কাফেররা তাঁকে সময়মতো নামায পড়তে দিল না তখন তাঁর যবান মুবারক থেকে কঠিন বদ দুআ বের হয়ে এল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এদের ঘরগুলো ও কবরগুলোকে আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।' সূর্য ডুবে গেল অথচ এরা আমাদেরকে সালাতুল উসতা (আসরের নামায) পড়তে দিল না। (সহীহ বুখারী ১/৪১০; সুনানে তিরমিযী ২/১২৭)

সাহাবীদেরও নামাযের সাথে ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত।

হযরত আবু বকর রা.-এর নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়ে থাকতেন, মনে হত, একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর রা.কে যখন কুখ্যাত আবু লূলূ খঞ্জর দিয়ে আহত করে তখন তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি যদি নামায পড়তেই অক্ষম হয়ে যাই তবে বেঁচে থেকে আর লাভ কী?'

এক যুদ্ধের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুজন সাহাবীকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাজির অপরজন আনসারী। দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের একজন রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাহারা দিবে অপরজন বিশ্রাম নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন উঠে পাহারা দিবে আর প্রথম জন বিশ্রাম নিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের প্রথমভাগে আনসারী সাহাবী পাহারা দেওয়া শুরু করলেন এবং মুহাজির সাহাবী শুয়ে পড়লেন। আনসারী সাহাবী ভাবলেন শুধু বসে না থেকে বরং নামায পড়ি। নামায শুরু করার পর শত্রুশিবির থেকে এক কাফের এসে

তাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তীর ছুড়ল। তিনি অবিচল দাড়িয়ে থাকলেন। ঐ দুশমন মনে করল তীর হয়তো ঠিকমতো লাগেনি। তাই সে আবার তীর ছুড়ল। এদিকে ঐ সাহাবী একভাবেই দাড়িয়ে রইলেন। ওদিকে ঐ দুশমনও একের পর এক তীর ছুড়তে লাগল। আর তা সাহাবীকে বিদ্ধ করতে থাকল। সাহাবী ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদা আদায় করে যথারীতি নামায শেষ করলেন এবং মুহাজির সাথীকে জাগ্রত করলেন। মুহাজির সাহাবী তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং ঘটনা শুনে বললেন, তুমি আমাকে আরো আগে কেন জাগ্রত করনি? আনসারী উত্তর দিলেন, আমি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, শেষ না করে রুকুতে যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু পরে আশঙ্কা হল আমার গায়ে যেভাবে তীর বিদ্ধ হচ্ছে তাতে যেকোনো অবস্থায় আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। আর তোমাকে জাগানোর আগেই যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে পাহারা দিতে বলেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ফেলেছি। যদি এ আশংকা না হত তাহলে সূরা শেষ না করে আমি রুকুতে যেতাম না। যদিও আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাক না কেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীদের নামায সংক্রান্ত এরূপ বহু ঘটনা কিতাবের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তদ্রূপ আমাদের সালাফ ও আকাবিরের সম্পর্কেও এ রকম প্রচুর ঘটনা রয়েছে। ছোট্ট একটি ঘটনা:

একবার এক বুযুর্গ উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতে কি নামায থাকবে? তাঁকে বলা হল, জান্নাত তো প্রতিদানের স্থান। সেখানে তো নামায পড়তে হবে না। ঐ বুযুর্গ একথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করলেন আর বলতে লাগলেন, তাহলে কীভাবে সেখানে থাকব?

নবীজী তো বলেছেন, নামাযে আমার চোখে শীতলতা।

নবীজীর সাহাবীরা তো নামায বিহীন জীবনকে অনর্থক মনে করতেন। নামাযের মধ্যে সামান্য অমনোযোগিতার কারণে তাঁরা লক্ষ টাকার বাগান সদকা করে দিতেন। কিন্তু

হায়! আমরা তো এতই হতভাগা যে, চক্ষুর শীতলতা লাভ করা তো দূরের কথা, তাঁরা যেমন প্রশান্তি লাভ করতেন, তার মর্ম উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। অন্তত তাঁদের বরকতময় ঘটনাগুলো পড়া ও স্মরণ করার দ্বারা দিলের মধ্যে যদি সামান্য উত্তাপ তৈরি হয় তাতেই বা কম কী?

যে আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নামাজ'। (বুখারি ও মুসলিম)

তাই প্রিয়নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) নামাজকে ঈমানের পর স্থান দিয়েছেন। নামাজের গুরুত্ব ও ফায়েদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে অসংখ্য হাদিন বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন হযরত মুহম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা মনোনীত সর্বোত্তম আমল হলো নামাজ। অতএব যে বেশি বেশি নামাজ পড়তে সক্ষম, সে যেন বেশি বেশি নামাজ পড়ে। (তাবারানি)

প্রিয়নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) নামাজের গুরুত্ব বুঝাতে হাদিসের মাধ্যমে একটি উপমা প্রদান করেছেন

হজরত আবু যর গিফারি (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) এক সময় শীতকালে বাইরে (কোথাও) তাশরিফ আনলেন। তখন গাছের পাতা ঝরার মওসুম

ছিল। প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন। ফলে তার পাতা আরো বেশি ঝরতে লাগল।

অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন-

মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ ঝরে পড়ে; যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (মুসনাদে আহমদ)

নামাজই একমাত্র ইবাদত; যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার সব কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। এ নামাজই মানুষকে দুনিয়ার সব পাপ-পংকিলতা থেকে ধুয়ে মুছে পাক-সাফ করে দেয়। দুনিয়ার সব অন্যায়-অনাচার থেকে হেফাজত করে।

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা ও ফযীলত -১ :

দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে নামাজের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। নামাজ হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে সালাতের হিফাযত

করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।" (ইতোপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩]

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: **১৯**]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد[٢٨ :

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه[١٤ :

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه[١٢٤ :

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় ফযীলত-২

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ [البقرة: ٤٥]

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, "নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২] আয়াত:ল-'হকাল ও পরকালের সফলতা।

"আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الاعلا: ١٤، ١٥]

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত “ফালাহ” শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢]

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।”

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

“তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায়

আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, “যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরেরহয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও”। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج: ١٩، ٢٣]

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِه«ِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة١٠٨:

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

সালাতের নির্দেশ ও পরিপ্রেক্ষিত : সালাতের নির্দেশ আল্লাহ থেকে মিরাজের সময় হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। সালাত (নামাজ) মুসলিম জীবনের অপরিহার্য একটি বিষয়, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং স্বীয় সত্তা ও সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধবিশেষ। হায়াতের প্রতিটি পরতে-পর্যায়ে ও স্তরে সালাতের সঙ্গে সময় সম্পৃক্ত।

আল্লাহতাআলা বলেন, নিঃসন্দেহে সালাত বিশ্বাসীর ওপর সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। (সূরা নিসা,আয়াত-১০৩)। সালাত সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়ে, দায়িত্বপরায়ণতার দীক্ষা দিয়ে, পবিত্র অনুভব ও আবেগের এমন এক স্বর্ণালি শৃঙ্খল রচনা করে, যা আপাতদৃষ্টিতে মানুষকে কেবল শৃঙ্খলিতই করে না; উপরন্তু তা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পবিত্র দাসত্বের বন্ধনের মাধ্যমে অপরাপর সব বন্দিত্ব থেকেও মুক্তি দেয়।

হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে সালাত প্রতিষ্ঠা করল, সে দীনকে প্রতিষ্ঠা করল আর যে সালাতকে বিনষ্ট করল, সে দীনকেই বিনষ্ট করল। সালাত মনোদৈহিক তথা মানসিক, মৌখিক ও দৈহিকের সঠিক সমন্বয়ের একটি সমন্বিত ইবাদত। যার সঙ্গে আর্থসামাজিক অন্যান্য বিষয়ও জড়িত। আর্থিক বিষয়টি হালাল রিজিকেরও অন্তর্ভুক্ত এবং হালাল জীবিকা দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে এবং দৈহিক-জৈবিক পবিত্রতা সালাতের মৌলিক ও প্রাথমিক শর্তও বটে। নামাজের অন্যতম শিক্ষা 'খুশুখুজু' (বিনয় ও নম্রতা)। আর একাগ্রতাই সালাতকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

কেবলই অনুভূতিহীন ঠোঁট নড়াচড়া ও ওঠাবসার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। পবিত্র আমেজ ও আবেগে, অনুভূতিতে, চক্ষু মুদে জাগতিক জগতের চৌহদ্দি ভেদ করে আরশের ফরশে সিজদাহকে পৌঁছাতে পারে; সে-ই সালাতকে প্রাণবন্ত করতে পারে। এরূপ সালাত মানুষের সুস্থ চিন্তা, ইমানি জীবনকে পূর্ণতা দেয়।

আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। সেই মহান অস্তিত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিত সালাত আদায় করা এবং স্বীয় সালাতের পবিত্র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করা। লৌকিকতার নামাজে কোন পুণ্য নেই। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে

ঘোষণা করেছেন আফসোস! সে সকল নামাজির জন্য যারা তাদের নামাজকে ভুলে থাকে এবং লোক দেখানো নামাজ পড়ে। (সূরা মাউনঃ আয়াত : ৫-৬)

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম নামাজ:

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوۃِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ﴿١٥٣﴾

হে মু’মিনগণ! ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

সালাত এবং ‘সবর’-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবং সবরকারীগণের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ আরশের উপর থেকেও তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দুটি। প্রথম. সাধারন অর্থে সাথে থাকা। যা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহর জ্ঞানের ভিতরে থাকা। মহান আল্লাহর যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত।

তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার সাথে থাকা বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী, মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহর পক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথে

লেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

নামাজের অংশ সমূহের গুরুত্ব ও ফজিলত:

রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ ইসলামের অন্যান্য সব ইবাদত পৃথিবীর জমিনে ফরয হয়েছে। আর নামায ফরয হয়েছে আসমানের ওপর। শুধু তাই নয়, নামায আরশের পাশে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের উপস্থিতিতে ফরয হয়েছে। এজন্য নামাযের প্রতি যে ধরণের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অন্যান্য ইবাদাতের ব্যাপারে এ ধরণের গুরুত্বের কথার উল্লেখ নেই। তেমনি কুরআন-হাদীসে নামাযের কথা যেভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, অন্যান্য ইবাদাতের বেলায় এমনটি বলা হয়নি।

তাকবীরে তাহরীমার গুরুত্ব ও ফযীলত: নামাযে আল্লাহু আকবার বলা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল বস্তু থেকে উত্তম। ২. প্রত্যেক জিনিসের একটা মূল মর্ম থাকে, ঈমানের মূলমর্ম হচ্ছে নামায আর নামাযের মূলমর্ম হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা। ৩. যখন নামাযী আল্লাহু আকবার বলে, তখন আসমান-যমীনের সব কিছুই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। ৪. হাদীস শরীফে আছে, তাকবীরে তাহরীমা বা ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলা হাজারো উট সদকা করার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ তার সওয়াব এক হাজার উট আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার চেয়ে বেশি হয়।

কিরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত:

১. হযরত আলী রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের যে কোন একটি হরফ পড়ে বা শ্রবণ করে, সে দশটি সওয়াব পায়। তার দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতে তার মর্যাদা দশ ধাপ এগিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নামাযে বসাবস্থায় কুরআন পড়ে, প্রতিটি হরফের বদলে সে ৫০টি করে সওয়াব, ৫০টি করে গুনাহ মাফ এবং জান্নাতে ৫০ ধাপ করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন পড়ে, সে প্রতি হরফের পরিবর্তে একশ একশ করে সওয়াব লাভ করে, একশটি করে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এবং জান্নাতে তার মর্যাদা একশ ধাপ করে এগিয়ে যায়।

২. যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সূরা ফাতিহা শ্রবণ করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে শুরু থেকে জিহাদে শরীক হয়ে একেবারে শত্রু দেশ জয় করে এসেছে। তথা সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার শেষের দিকে এসে শরীক হয়। সে ঐ ব্যক্তির মত যে জিহাদের অংশ গ্রহণ করেনি কিন্তু বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সময়ে এসে উপস্থিত হল। পার্থক্যটা নিচের ঘটনা থেকে স্পষ্ট আকারে ফুটে উঠবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কে একটি বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহিনীর সবাই জিহাদে চলে গেলেন, কিন্তু তিনি এই ভয়ে জিহাদে যাননি, যে হয়তো আমি শহীদ হয়ে যাব আর কখনো রাসূলের পিছনে জুমা পড়ার সুযোগ পাব না। অর্থাৎ শুধু রাসূলের পিছনে জুমার নামায পড়ার আশায় জিহাদে যাননি। জুমার পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন জিহাদে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন- তিনি ধারণাটাকে দ্বিতীয়ববার ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আমি এখনই যাব। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুল্লাহ! বাহিনীর অন্যান্য সদস্য এবং তোমার মাঝে পাঁচ শত বছরের পার্থক্য হয়ে গেল। অর্থাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোমার এবং তাদের মাঝে এত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হল। (মিশকাত)

কিয়াম বা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার ফযীলত:

১. বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার ওপর সওয়াবের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে।

২. যখন বান্দা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন আসমানের সব দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হয়। তার এবং আল্লাহর মাঝে যত রূহানী পর্দা আছে সব সরিয়ে ফেলা হয়।

৩. নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালে মৃত্যু যন্ত্রণা এবং কঠোরতা দূরিভূত হয়ে যায়।

৪. নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সহজে পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার বড় একটা উপায়।

রুকুর গুরুত্ব ও ফযীলত:

১. বান্দা যখন রুকু করে, তখন নিজের শরীরের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকাহ করার সওয়াব পায়।

২. বান্দা যখন রুকুর তাসবীহ বলে, তখন সমস্ত আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করার সওয়াব পায়।

৩. বান্দা যখন রুকু থেকে উঠে, তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। (শরহে আরবায়িনা নববিয়্যাহ)

সিজদার গুরুত্ব ও ফযীলত:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সিজদা করার সময় বান্দা আল্লাহর যতটা নিকটবর্তী হয়, এতটা নৈকট্য অন্য কোন ইবাদতে অর্জিত হয় না। সুতরাং তোমরা সিজদার মধ্যে বেশি বেশি দোয়া কর। (মুসলিম)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে বেশি পরিমাণে সিজদা কর। (মুসলিম শরীফ)

৩. আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় অবস্থা হলো, সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং তার চেহারা আল্লাহর সামনে মাটিতে পড়ে থাকবে। (তারগীব)

৪. মানুষ যখন সিজদা করে, তখন শয়তান কেঁদে কেঁদে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং বলে আফসোস! মানুষের ওপর সিজদা করার হুকুম হল আর অমনি তারা সিজদা করে জান্নাত কিনে নিল। অথচ আমার ওপর যখন সিজদা করার হুকুম হয়েছিল, আমি তা অমান্য করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেলাম।

৫. যখন নামাযী সিজদা করে, তখন সে সমস্ত জ্বীনজাতি এবং মানবজাতির সংখ্যার সমপরিমাণ সওয়াব পায়, আর যখন সিজদার তাসবীহ বলে, তখন একটা দাস মুক্ত করার সওয়াব পায়। (শরহে আরবায়িনা নববিয়্যাহ)

৬. মাদান বিন তালহা রা. বলেন, আমার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম হযরত চাওবান রা. এর সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলুন যেটা করলে আমি কোন কষ্ট ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেও কোন উত্তর দিলেন না। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশি পরিমাণ সিজদা করতে থাক। কেননা প্রত্যেক সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন। (মু্সলিম শরীফ)

তাশাহুদের গুরুত্ব ও ফযীলত:

যখন নামাযী তাশাহুদ পড়ার জন্য বসে, তখন সে ধৈর্যধারণকারীদের সওয়াব পায়। অর্থাৎ হযরত আইয়ূব আ. হযরত ইয়াকুব আ. হযরত ইয়াহইয়া আ. প্রমুখের মত বড় বড় ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যক্তিত্বদের অনুরূপ সওয়াব অর্জন করে। এটা আল্লাহরই ধর্ম। তিনি যাকে যতটুকু চান সওয়াব দিতে পারেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১০৫)

দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও ফযীলত:

দরূদ শরীফ মানে হচ্ছে আল্লাহর দরবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য এমন রহমতের দোয়া করা যা উভয় জাহানোর জন্য কল্যাণকর হয়। নিম্মে কিঞ্চিত আলোচনা করা হল।

উলামায়ে কেরাম লিখেন, জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরয। যে রকমভাবে পুরো জীবনে একবার নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করা ফরয।

২. কাজী আবু বকর বলেন, আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার ওপর রাসূলের ওপর দুরূদ পড়াকে ফরয করেছেন। তবে তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি। পবিত্র কুরআনে বাণী- হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ওপর দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬)

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, নামাযের শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়া ফরয।

৪. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নত। কোন মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম কয়েকবার উচ্চারিত হলে একবার দুরূদ পড়া ওয়াজিব। না পড়লে গুনাহগার হবে। তবে প্রতিবার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব এবং অনেকে সওয়াব অর্জিত হয়।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দশবার রহম করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। (নাসায়ী শরীফ)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার ওপর সর্বাধিক দরূদ প্রেরণ করবে বা আমার প্রতি সর্বাধিক দুরূদ প্রেরণকারী ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করবে। (তিরমিযী শরীফ)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ এমন কতিপয় ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যাদের কাজ হল তারা পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং আমার প্রতি উম্মতের পক্ষ থেকে দুরূদ-সালাম পাঠিয়ে দিবে। (নাসায়ী শরীফ)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তার জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। (মুসনাদে আহমদ)

৯. হযরত উমর রা. বলেন, দোয়া আসমান এবং জমীনের মাঝখানে থেমে থাকে, একদম ওপরে ওঠে না। যতক্ষণ না তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরূদ পাঠ কর। (তিরমিযী শরীফ)

সালাম ফিরানোর গুরুত্ব ও ফযীলত: নামাযী যখন নামায থেকে ফারেগ হতে সালাম ফেরায়। তখন তার বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতের আটটি দরজার সবকটি খুলে দেন। যাতে নামাযী নিজ ইচ্ছামত প্রবেশ করার অধিকার লাভ করে। (মাজালিসে সুন্নিয়া)

মুমিনের বেঁচে থাকার স্পন্দন নামাজ :

নামাজ প্রতিক্ষণের সুস্থির অনুভব-উপলব্ধি, তিলাওয়াত-তাসবিহ, রুকু-সিজদার জন্য যে তৃষ্ণা তৈরি করে, মৃত্যুর পরও তা বাকি থেকে যায়। সালাতের ব্যবহারিক ও বাহ্যিক দিকগুলো স্বল্পসময়ে আয়ত্তে আনা যেতে পারে, তবে অভ্যন্তরীণ উন্নতির ক্রমধারা যা উপলব্ধি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্ম দেয়, তা আমৃত্যু শাণিত করতে হয়। তাই সালাত প্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত শিক্ষার ও অনুশীলনের বিষয়টিও অন্তহীন।

শাণিত ও শাশ্বত সালাত কেবল সালাতই নয়, তা মুমিনের বেঁচে থাকার হৃৎস্পন্দনও বটে। আত্মার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে এবং প্রকৃত আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। সেই মহান অস্তিত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিত সালাত আদায় করা এবং স্বীয় সালাতের পবিত্র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করা। এভাবেই সালাত একজন মুসল্লির জীবনকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে এবং সালাতবিহীন জীবনের হাহাকার দূর করতে সালাতের বিকল্প আর কিছু নেই।

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হলো সালাত। রাসুল (সা.) বলেন যে সালাত প্রতিষ্ঠা করে, সে তার পুরো দীন (জীবনবিধানকে) প্রতিষ্ঠা করে; যে সালাত বিনষ্ট করে, সে পুরো দীনকেই বরবাদ করে দেয়। (বুখারি)। কোরআন ও হাদিসে সালাত পড়া নয়, প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাত হিসাব করেই সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে পড়া আবশ্যক। কেননা, কেয়ামতের দিন সবার আগে সালাতেরই হিসাব নেওয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম)। সালাত পবিত্রতার প্রতীক ও জান্নাতের চাবিকাঠি। (বুখারি ও তিরমিজি)।

রাসুল (সা.) বলেন যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করে, সে জাহান্নামি।’ রাসুল (সা.) বলেন, ইমান ও

কুফরের মধ্যবর্তী দেয়াল হলো সালাত। সালাত মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন শিক্ষা দেয়। মানুষ যা দেখে তা শেখে, তা ভাবে। তাই দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ মননিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিহার্য; এর দ্বারা কর্মও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ জন্যই সালাতে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাকবিরে তাহরিমার সময় দৃষ্টি সিজদার জায়গায়। দাঁড়ানো অবস্থায়ও দৃষ্টি সিজদার জায়গায়। রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে। পুনরায় দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গায়। সিজদা অবস্থায় দৃষ্টি নাকের আগায়। বসা অবস্থায় দৃষ্টি নাভিতে। সালাম দেওয়ার সময় দৃষ্টি কাঁধে নিবদ্ধ থাকবে। এভাবে সালাত আদায় করলে মনোনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে, সালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সফল হবে।

জামাআতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করে দিয়েছেন। আবার এ নির্ধারিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে জামাআতে আদায় করার ব্যাপারে তিনি সুনানে হুদা নির্ধারণ করেছেন। বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জামাআতে নামাজ আদায়ে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। মসজিদে ইমামের সঙ্গে জামাআতে নামাজ আদায়ের মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ হিকমত এবং বিশ্বনবির গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের বাস্তবায়ন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার জীবনে কখনো জামাআত ব্যতীত নামাজ আদায় করেননি। আজান শোনার পর ওজর ব্যতীত জামাআতে উপস্থিত না হওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।যারা আজান শোনার পর জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করে না তারা দুনিয়ার কল্যাণ ও হিকমত এবং বিশ্বনবির গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত পালন থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাআতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ

করেছেন।হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আজান শোনার পর নামাজের জামাআতে (মসজিদে) উপস্থিত হয় না এবং জামাআতে উপস্থিত না হওয়ার কোনো ওজর বা কারণও না থাকে; এমতাবস্থায় যদি সে একাকি নামাজ আদায় করে, তবে ওই ব্যক্তির (একাকি) নামাজ কবুল হবে না।একজন সাহাবা জানতে চাইলেন, ওজর বা কারণ বলতে কি বোঝায়? উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ভয় অথবা অসুস্থতা। (আবু দাউদ)নামাজ আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে সময় অনুযায়ী জামাআতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারেও সঠিক পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অন্য হাদিসে এসেছে-হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ‘হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য সুনানে হুদা বা হিদায়াতের পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করাই হচ্ছে সুনানে হুদা।তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় করা শুরু কর, যেমন অমুক ব্যক্তি জামাআত ছেড়ে ঘরে নামাজ আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবির সুন্নাত ছেড়ে দিলে। যদি তোমরা নবির সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে হিদায়াতের পথ থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়বে। (মুসলিম, মিশকাত)পরিশেষে...নামাজের জামাআতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বনবির ছোট্ট একটি হাদিস দিয়ে শেষ করতে চাই। বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নামাজের আজান হওয়ার পরও যারা ঘর থেকে মসজিদে নামাজের জামাআতে উপস্থিত হয় না। যদি সেসব ঘরে নারী এবং শিশু না থাকতো, তবে তিনি সে সব ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতাম।

ফজরের নামাজের উপকিরিতা:

ফজরের বিশেষ গুরুত্ব যেমন নামাজের মধ্যে আছে, তেমনি সময়ের মধ্যেও। কোরআনে সুরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, শপথ ফজরের। (সুরা ফজর, আয়াত: ১)

ফজরের নামাজ পড়ার কয়েকটি উপকারের কথা জানা যাক:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।' (মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৭)

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।' (মুসলিম, হাদিস: ১৫৭৩)

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ফজরের নামাজ আদায় করল, সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো।' (মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯)

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 'সেই মানুষটি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।' (মুসলিম, হাদিস: ১৩২২)

৫. রাসুল (সা.) বলেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার চেয়ে বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।' (বুখারি, হাদিস: ৬৫৭)

৬. খলিফা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বরাতে একটি হাদিস জানা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গণিমতের সম্পদ অর্জন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে যায়নি এমন একজন বলেন,'অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে ভালো গণিমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোনো সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি।'

তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের কথা বলব না, যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাজে জামাতে হাজির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ তাআলার জিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুনানে তিরমিজি: ৩৬৪১)

নামাজে বান্দার প্রশান্তি:

নামাজে কী বান্দার প্রশান্তি মেলে?

নামাজে মুক্তি। নামাজে প্রশান্তি। নামাজে মেরাজ। নামাজে বান্দার সাথে প্রভূর কথোপকথন। নামাজই সব। হাশরের মাঠের চালান পুঁজি হলো নামাজ। ঐ দিন বান্দার নামাজের হিসাব আগে নেয়া হবে। পার্থিব জীবনে যারা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে তারাই উভয় জাহানে সফলকাম। পার্থিব বিপদ-আপদ বালা-মুসিবত দূরীকরণে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা নামাজের মাধ্যমে আমার সাহায্য কামনা করো। কুরআনে ইরশাদ,' হে মুমিন গণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।' (সূরা আল-বাকারা: ১৫৩)।

নামাজ বান্দার আমলনামা থেকে গোনাহ গুলো ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে নিষ্পাপ বানিয়ে দেয়। হযরত আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা বলতো, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবাগণ উত্তরে বললেনঃ না, কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না। অত:পর রাসূল (সা:) বললেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত এমনই। এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক নামাজীর সকল গোনাহ মাফ করে দেন।' (বোখারি:৫০৩)।

নামাজ আদায় করতে হলে দেহ-মন পবিত্র রাখতে হয়। অন্তরের পবিত্রতার সাথে সাথে বাহ্যিক পবিত্রতা বজায় রাখতে হয়। নামাজ এমনই এক আমল যা পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা যায় না। যারা যথাযথ নিয়মে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করবে আল্লাহতায়ালা তাদের নিকট থেকে জাহান্নামের আগুন দূরে রাখবেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই ঐ সকল ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে খুশু-খুযুর সাথে আদায় করে।' (সূরা মুমিনূন:১-২)।

হযরত হানজালা উসাঈদী (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ পাবন্দির সাথে আদায় করে, উত্তমরূপে অজু করে, সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে, রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে এবং এভাবে নামায আদায়কে নিজের উপর আল্লাহ তা'আলার হক মনে করে তবে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেয়া হবে।' (মুসনাদে আহমাদ-৪: ২৬৭পৃ.)।

হযরত নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'যার এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেল তার যেন ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ও ধন দৌলত সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হলো।' (ইবনে হিব্বান-৪:৩৩০ পৃ.)।

হাশরে মাঠে নামাজের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আমলের হিসাব নেয়া হবে। যারা নামাজের হিসাব সঠিকভাবে দিতে পারবে। তাদের জন্য অন্যান্য আমলের হিসাব সহজ করে দেয়া হবে। নামাজী বান্দা হাশরের মাঠে আনন্দ উল্লাস করতে থাকবে। ঐ দিন তাদের কোনো ভয় থাকবে না। দুনিয়াতে যারা নামাজ সম্পর্কে গাফেল ছিলো, সেদিন তারা হা-হুতাশ করতে থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেয়া হবে। যদি নামাজ ঠিক থাকে তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি নামাজের হিসাবে গড়মিল হয়, অন্যান্য আমলও ক্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে।' (তিরমিযি-১:২৪৫পৃ.)।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,'তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।' (সূরা বাকারা:১১০)।

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।' (সূরা ফাতির:২৯)।

নামাজ আদায়কারী বান্দার অন্তর সব সময় প্রশান্ত থাকে। তাদের দেহ-মনে কোনো কালিমা থাকে না। তারা সর্বোচ্চ নেয়ামত জান্নাতের উত্তরাধীকারী হবেন। তাদেরকে পরোকালে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা নিজেদের সালাতের হিফাজত করে, এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করবে।' (সূরা মা'আরিজ :৩৪-৩৫)।

'যারা তাদের সালাত সমূহের হিফাজতকারী, মূলত: এরাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী এবং সেখানে তারা স্থায়ী ভাবে থাকবে ।' (সূরা মুমিনুন: ৯-১১)

বিভিন্ন প্রকার সালাত:

১.সালাতুল বিতর:

'বিতর' আরবি শব্দ। এর অর্থ বেজোড়। এ সালাত তিন রাকআত বিধায় এটিকে বিতর বলা হয়। এশার সালাতের পর তিন রাকাআত বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

বিতর সালাত পড়ার নিয়ম:

অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় দুই রাকআত সালাত পড়ে তাশাহহুদ পড়তে হয়। এরপর তৃতীয় রাকআতেরে জন্য দাড়িয়ে সূরা ফাতিহার পর কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে হয়। কিরাআত শেষ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হয়। তারপর হাত বেঁধে চুপে চুপে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। দোয়া কুনুত শেষে রুকুতে যেতে হয়। তারপর যথারীতি দুই সিজদার পর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিতর সালাত সমাপ্ত করতে হয়।

২.জুমার সালাত:

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন। আর এই দিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো জুমার সালাত। জুমা শব্দের শাব্দিক অর্থ একত্রিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া, সমবেত হওয়া ইত্যাদি। শুক্রবারে সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে যুহরের সালাতের পরিবর্তে জামাআত সহকারে যে সালাত আদায় করে তা হলো জুমার সালাত।

জুমার সালাতের গুরুত্ব:

জুমার সালাত আদায় করা ফরয। কেউ যদি এই সালাতকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে। বিনা ওযরে কেউ যদি পর তিন জুমআহ বাদ দেয় তাহলে

সে আল্লাহর কাছে মুনাফিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এই সালাতের অনেক ফযিলত রয়েছে। সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

‘হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।'

(সুরা জুমু'আ, আয়াত-৯)

জুমার দিনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, ‘সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।' (বুখারি) জুমার দিনে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি। হযরত ফাতিমা (রা.) শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে আসরের পর কাজকর্ম ছেড়ে আল্লাহর যিকর ও দোয়ায় শামিল হতেন। এদিনে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার অধিক সম্ভবনা রয়েছে।

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম:

ইসলামে জুমার সালাত আদায়ের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন – মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পর পর তিন জুমার সালাত পরিত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয় (তিরমিযি)।

জুমার দিনে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল অযু ও দুই রাকাআত দুখুলুল মসজিদ নফল সালাত আদায় করে চার রাকাআত কাবলাল জুমা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে হয়। এর পর ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সময় উপযোগী খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন। মুসল্লিদের জন্য এই খুতবা শোনা ওয়াজিব। এই সময় কথা বলা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের পিছনে দুই রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। কোনো কারণে জুমার সালাতে শরিক হতে না পারলে যুহরের সালাত আদায় করতে হয় ।

জুমার দিনের আদব:

১. জুমার দিনে ইবাদাতের নিয়তে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩. নখ কাটা।

৪. সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।

৫. জুমা দিবসে বেশি করে দরুদ পড়া।

৩.সালাতুল জানাযা

জানাযা শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো খাট বা খাটিয়া, খাটিয়ার উপর দাফন কাফনের জন্য রক্ষিত লাশ। আর সালাতুল জানাযা হলো এক বিশেষ সালাত যা মৃত মুসলমানকে কবর দেওয়ার আগে অনুষ্ঠিত হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে জানাযার সালাত হলো ‘ফরযে কেফায়া’। সমাজের কিছুসংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। এই সালাতের

মধ্যে রুকু ও সেজদা করার বিধান নেই। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জানাযার সালাত বসে আদায় করার সুযোগ নেই।

জানাযা সালাতের ফরয ২টি

১. চার তাকবির বলা

২. দাড়িয়ে সালাত আদায় করা।

জানাযা সালাতের ওয়াজিব ১টি

১. তাকবিরের পর ডানে ও বামে দুবার সালাম বলে সালাত শেষ করা।

জানাযা সালাতে সুন্নত ৩টি

১. হামদ ও সানা পড়া।

২. দরুদ শরিফ পড়া।

৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

জানাযা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

জানাযা সালাত মূলত মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের পক্ষ থেকে বিশেষ দোয়া ইসলামি শরিয়তে জানাযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। জানাযা সালাতে মৃত-জীবিত, উপস্থিত, অনুপস্থিত নারী-পুরুষ সবাইকে দোয়ার মধ্যে শামিল করা হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) জানাযা সালাতে শুধু মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় না বরং জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলে উপকৃত হয়। রাসুলুল্লাহ

(সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে তার জন্য এক কিরাত (অসীম সওয়াব) আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য সম্পাদন হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে তার জন্য দুই কিরাত (অসীম সওয়াব) রয়েছে।' (তিরমিযি) উল্লেখ্য, একেকটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ। সুতরাং আমরা জানাযা সালাত আদায় করে অসীম সওয়াব লাভের চেষ্টা করব।

সালাতুল জানাযা আদায়ের নিয়ম:

মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে মুখ রেখে ইমাম বুক বরাবর দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করতে হবে। প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। অতঃপর সানা পড়বে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন 'ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা' এর পর 'ওয়া জাল্লা সানা উকা' বাক্যটি পড়া হয়। সানা শেষ হলে হাত বাঁধা অবস্থায় দ্বিতীয় তাকবির বলে দরুদ শরিফ পড়বে।

এরপর আবার তৃতীয় তাকবির বলে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আলাল ইমান।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের মধ্যে ছোট ও বড়, আমাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ সকলকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনি যাদেরকে মৃত্যু দেবেন, তাদেরকে ইমানের ওপর মৃত্যু দান করুন।

৪.ঈদের নামাজ:

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, খুশি, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের জন্য এক আনন্দ ও উৎসবের দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ একত্রে ঈদগাহে সমবেত হন এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে। ঈদের দিন বিশ্বের সকল মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোট-বড়, আমির-ফকির একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ইবাদাত পালন করে থাকেন।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম:

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের মতো হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তার সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লি খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের

অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

ঈদের সালাতের সামাজিক প্রভাব:

ঈদ মানে মহা আনন্দের আয়োজন। ঈদ আমাদের সমাজ সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঈদ ধর্মীয় উৎসব হলেও এটি এখন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঈদের দিন পরিবারের যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবাই একত্র হয়ে থাকে। সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার এটাই সর্বোত্তম সুযোগ হয়ে থাকে। ঈদের দিন মুসলমানরা একে অপরের খোঁজখবর নেয় ও একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে থাকে। ধনী-গরিব সবাই সকল প্রকার দুঃখ ভুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করে। সকল ভেদাভেদকে ভুলে সবাই একত্র হয়। ঈদের দিন পুরুষরা দলে দলে ঈদগাহে যায়। ছোট ছোট শিশুরা বাবা, ভাই ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে নতুন জামাকাপড় পড়ে ঈদগাহে যায়। সবার মধ্যে এক আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। জামাআতবদ্ধ হয়ে সবাই নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। ঈদগাহে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার সকলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ পায় সবাই। এর মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। গরিব ও অসহায়েরা বিভিন্ন সমস্যার কথা উপস্থিত মুসল্লিদের বলার সুযোগ পায় ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। ঈদের দিন সবাই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে যায়। কুশল বিনিময় করে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে আত্মীয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়। ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় একে অপরে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে। যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত হয়।

৫.সালাতুত তারাবিহ:

তারাবিহ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা।

'তারাবিহ' শব্দটি আরবি তারভিহাতুন থেকে এসেছে, যার অর্থ বিশ্রাম করা, প্রশান্তি লাভ করা।

তারাবি নামাজে যেহেতু প্রতি চার রাকাত পর পর একটু বিশ্রাম নিয়ে তাসবিহ ও দোয়া পাঠ করা হয়, তাই এই নামাজকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবি নামাজ বলা হয়।

তারাবির নামাজ এশার ফরজ ও সুন্নত নামাজের পর এবং বিতিরের পূর্বে আদায় করা হয়। তারাবির নামাজ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। যেটা গুরুত্বের দিক থেকে ওয়াজিবের কাছাকাছি।

তারাবিহ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত:

মাহে রমযানে তারাবিহ নামায আদায় করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মহান আল্লাহ তা—আলা মাহে রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং রাতে তারাবিহ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে পুণ্যের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র রমযান মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি

খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একমাসেই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন।

তারাবির ফজিলত সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় কিয়ামুল লাইল তথা তারাবি আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

(বুখারি ও মুসলিম)

তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সুরার মাধ্যমেও আদায় করা যায়। আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়।

ফজিলতপূর্ণ এ নামায রমযানের পুণ্যময় সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

৬.মাসবুকের সালাত:

যে মুক্তাদি ইমামের সাথে সালাতের প্রথম রাকআত থেকে পায় নি, তাকে মাসবুক (পিছে পড়া) বলে। মাসবুক ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রণ করবে। তারপর ইমামের সাথে সে নামায পড়তে থাকবে এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ করে তাশাহহুদ পাঠের জন্য শেষ বৈঠকে বসে যাবে এবং 'আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু' পযর্ন্ত পড়ে অপেক্ষা করবে। ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুক ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া

রাকআতগুলো যথারীতি আদায় করবে। অবশিষ্ট সালাতে তার নিজের ভুল হলে সাহু সিজদাহও করতে হবে।

প্রথমে কিরাআতওয়ালা রাকআত অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো রাকআত এবং পরে কিরাআতবিহীন শুধু সূরা ফাতিহাওয়ালা রাকআত পড়বে। তারপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে

রুকুসহ ইমামের সথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পেছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাসবুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার পর যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে নেবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত ফরয সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করবে এবং পরের রাকআতে

শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে । এরপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার রাকআত ছুটে গেলে অর্থাৎ মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সে একাকী চার রাকআত নামায পড়লে যেভাবে পড়ত, ঠিক সেভাবে চার রাকআত নামায আদায় করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

৭.অসুস্থ ব্যক্তির সালাত:

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। নির্ধারিত ওযর ব্যতীত সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। রুগ্ণ ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে অসুস্থ ব্যক্তির সালাত বলে।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম:

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। যথাসম্ভব ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে। নামাযের সমুদয় আরকান-

আহকাম যথাযথভাবে আদায় করতে সামর্থ্য না হলে ইশারায় হলেও ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।

রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদাহর সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচের বালিশ বা এ-জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব সেভাবে সালাত আদায় করতে হবে।

অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ণ ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ/ ছয় ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে না। এ নামায আদায় না করতে পারার জন্য মহান আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রাথর্না করবে।

নামাযরত অবস্থায় কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়তে হবে, বসে না পারলে শুয়ে বা ইশারা করে বাকি নামায আদায় করতে হবে।

৮.মুসাফিরের সালাত:

‘মুসাফির’ আরবি শব্দ। এর অর্থ সফরকারী। কোনো ব্যক্তি তার অবস্থানস্থল থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরে সফর করার নিয়তে বের হয়ে নিজ শহর বা গ্রাম পেরিয়ে গেলেই তিনি মুসাফির হয়ে যান। আর এ অবস্থায় গন্তব্যস্থলে কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত না করা পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। মানুষের জীবনে সফর কিংবা ভ্রমণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ যখন নিজের আবাসস্থলে থাকে, তখন পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু ভ্রমণে বা সফরে মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর করতে হয়। ‘কসর’-এর অর্থ হলো কম করা বা সংক্ষেপ করা। কসর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক ধরনের সুবিধা। শরিয়াত নির্ধারিত দূরত্বে সফর করা কালে সালাত সংক্ষেপ করা ইসলামের বিধান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা যখন জমিনে সফর করবে, তখন তোমাদের জন্য সালাতের কসর করায় কোনো দোষ নেই।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১০১)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআত বিশিষ্ট যোহর, আসর ও এশার ফরয সালাত দুই রাকাআত পড়বেন। কসর শুধু চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতেই হয়ে থাকে। অতএব, মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বিতরের সালাতে কোনো কসর নেই। আর এইভাবে সংক্ষেপে সালাত আদায়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ রেখেছেন। মুসাফির চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাত একাকী পড়লে বা মুসাফির ইমামের পেছনে আদায় করলে, কসর করবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ নামাজ পড়া ঠিক নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবির মুখে সালাতকে মুকিম অবস্থায় চার রাকাআত ও সফর অবস্থায় দুই রাকাআত ফরয করেছেন।' (মুসলিম) মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় ইচ্ছাকৃত চার রাকাআত সালাত পূর্ণ করবে না। কিন্তু

মুকিম ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুসাফির যদি মুকিমদের সঙ্গে সালাতে শরিক হয়, তবে সে যেন তাদের মতো চার রাকাআত সালাত পড়ে।' (ইবনে আবি শাইবা) মুসাফির ইমামতি করলে মুক্তাদিদের আগেই বলে দেবে যে সে মুসাফির এবং দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকিম মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকাআত সালাত আদায় করে নেবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সফর অবস্থায় সর্বদা সালাত কসর করেছেন। মুসাফির ব্যক্তির জন্য চলন্ত অবস্থায় সুন্নত না পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে স্বাভাবিক ও স্থির অবস্থায় সুন্নত সালাত আদায় করবে।

মৃত্যুর সময় রাসূল ﷺ যে কথাটি বারবরা বলছিলেন:

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের শেষ মূহুর্ত চলছে। 'ঠিক সে সময় একজন লোক এসে 'সালাম' জানিয়ে বললেন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি। রাসূল (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) বললেন, দুঃখিত আমার পিতা খুবই অসুস্থ। একথা বলে ফাতিমা (রাঃ) দরজা বন্ধ করে রাসূল (সাঃ) কাছে গেলেন। হযরত রাসূল (সা) বললেন, কে সেই লোক? ফাতিমা বললেন, এই প্রথম আমি তাকে দেখেছি। আমি তাকে চিনি না।

রাসুল (সাঃ) বললেন শুনো ফাতিমা, সে হচ্ছে আমাদের এই ছোট্ট জীবনের অবসানকারী ফেরেশতা আজরাইল। এটা শুনে হযরত ফাতিমার অবস্থা তখন ক্রন্দনরত বোবার মতো হয়ে গিয়েছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল আমার উম্মতের কি হবে? আমার উম্মতের নাজাতের কি হবে ? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হে রাসুল আপনি চিন্তা করবেন না, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আপনার উম্মতের নাজাতের জন্যে।

মৃত্যুর ফেরেশতা ধীরে ধীরে রাসূলের কাছে এলেন জান কবজ করার জন্যে। মালাকুল মউত আজরাইল আরো কাছে এসে ধীরে ধীরে রাসূলের জান কবজ করতে থাকলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিব্রাইলকে রাসূল বললেন ঘোঙানির সাথে, ওহ জিবরাঈল এটা কেমন বেদনাদায়ক জান কবজ করা। ফাতিমা (রাঃ) তার চোখ বন্ধ করে ফেললেন, আলী (রাঃ) তার দিকে উপুড় হয়ে বসলেন, জিবরাঈল তার মুখটা উল্টা দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল তুমি মুখটা উল্টা দিকে ঘুরালে কেন, আমার প্রতি তুমি বিরক্ত? জিবরাঈল বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাকারাতুল মউতের অবস্থায় আমি আপনাকে কিভাবে দেখে সহ্য করতে পারি!

ভয়াবহ ব্যাথায় রাসূল ছোট্ট একটা গোঙানি দিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহ সাকারাতুল মউতটা (জান কবজের সময়) যতই ভয়াবহ হোক, সমস্যা নেই, আমাকে সকল ব্যথা দাও আমি বরণ করবো, কিন্তু আমার উম্মাতকে ব্যথা দিওনা। রাসূলের শরীরটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো। তার পা, বুক কিছুই নড়ছে না এখন আর। রাসূলের চোখের পানির সাথে তার ঠোঁটটা কম্পিত ছিলো, তিনি কিছু বলবেন মনে হয়।

হযরত আলী (রাঃ) তার কানটা রাসূলের মুখের কাছে নিয়ে গেলো। রাসূল বললেন, নামাজ কায়েম করো এবং তোমাদের মাঝে থাকা দূর্বলদের যত্ন নিও। রাসূলের ঘরের বাইরে চলছে কান্নার আওয়াজ, সাহাবীরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে কান্নারত। হযরত আলী (রাঃ) আবার তার কানটা রাসূলের মুখের কাছে ধরলো, রাসূল চোখ ভেজা অবস্থায় বলতে থাকলেন, ইয়া উম্মাতি, ইয়া উম্মাতি, “হে আমার উম্মতেরা নামাজ, নামাজ..! নামাজ..!!

নামাজ পরিত্যাগের বিধান

কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাতই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এ জন্যেই আল্লাহ তা‘আলা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡ﴾ [البقرة: ١٤٣]

“আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

বিগত শরী‘আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী‘আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ [ابراهيم: ٤٠]

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا﴾ [مريم: ٣١]

“এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا ٥٥ ﴾ [مريم: ٥٥]

“সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ।

সালাত ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة«

“মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া”। (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

»العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر«

“আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, “সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।” (সুনান তিরমিযী)

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।”

উল্লিখিত ও অন্যান্য দলীলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে। আর এ মত পোষণ করেন ঈমাম আহমদ রহ. এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন:

»أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة

“সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সালাত”। (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু‘আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, “সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যখন সালাত তখন যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনাদের দীনের সর্বশেষ অংশ (সালাত)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।” (ইমাম আহমদের কিতাবুস সালাত)

বর্তমান যুগে আমাদের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুফুরীর ফাতওয়া দিয়েছেন, আর তাদের শীর্ষে রয়েছেন, মাননীয় (সাবেক) মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন রহ.

নামাজ না পড়ার শাস্তি:

কুরআনে বর্ণিত নামাজ তরককারীর শাস্তির কথাগুলো মানুষ জানতে পারলে নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে নিয়োজিত রাখবে। তাই কুরআনে ঘোষিত বেনামাজির শাস্তির কথাগুলো তুলে ধরা হলো-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝٥٩
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.۝٦٠

'নবী ও হেদায়েতপ্রাপ্তদের পর এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির পূজারি হলো। সুতরাং তারা ‘গাই’ নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না।’

সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫৯-৬০

বেনামাজির অবস্থান হবে সাকার নামক জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটি কাজের হিসাব নেবেন। আর প্রতি কাজের হিসাব দিতে না পারলে শাস্তি অবধারিত। শাস্তি প্রাপ্ত মানুষকে তাদের অপরাধে কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তাদের অপরাধগুলোও বলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সে কথা তুলে ধরেন এভাবে-

“ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۝٤٣

‘কোন জিনিস (কাজ) তোমাদেরকে (সাকার) জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

সুরা আল-মুদ্দাচ্ছির : আয়াত ৪২-৪৩

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে সময় মতো নামাজ আদায় করতেও বলেছেন। 'নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের জন্য সুনিদিষ্ট সময়ের সাথেই ফরজ করা হয়েছে'। (সুরা : আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)

যারা নামাজের বিষয়ে উদাসীন তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, দুর্ভোগ ওই সমস্ত নামাজিদের জন্য, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন। (সুরা : আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫)

নামাজ না পড়লে শুধু পরকালেই নয়, দুনিয়ার জীবনেও নেমে আসে অশান্তি, হতাশা, অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট। দুনিয়ার জীবনে বেনামাজির জন্য ৫টি শাস্তির কথা জানা যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে।

১. আল্লাহতায়ালা নামাজ ত্যাগকারীকে দুনিয়ার জীবনে সব কাজের বরকত থেকে মাহরূম/বঞ্চিত করেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (মুসলিম, হাদিস : ১৩০৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন, 'নামাজ হলো ঈমানদার ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। আবার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল তবে সে কুফরি করল'। (তিরমিজি : ২৬২০, আবু দাউদ: ৪৬৭৮)

২. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির চেহারায় কোনো নূর বা উজ্জ্বলতা থাকে না।

৩. যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে, ওই ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য ভালো কাজের কোনো পুরস্কারও পাবে না।

৪. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির জন্য কোনো লোক দোয়া করলে, তা কাজে আসবে না।

৫. নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহতায়ালা সব সৃষ্টিজীবের কাছে ঘৃণিত। কোনো সৃষ্টিজীবই তাকে পছন্দ করবে না।

৬. ইসলামের শান্তি ও প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হবে। (শারহুল আকিদাতুত তাহাবি : ২৬৮)

বে নামাজির পরিনতি::

১. আল কুরআনে বলা হয়েছে,

“অতঃপর এমন এক সময় আসল যখন লোকেরা নামায ছেড়ে দিল, আর লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে গেল।ফলে তারা শীঘ্রই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে যাবে। তবে কিছু লোক এ থেকে রেহাই পাবে, যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে।” (সূরা ১৯; মারইয়াম ৫৯-৬০)।

২. আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

“(পরকালে জান্নাতবাসীরা ঠাট্টার ভাষায় দোযখবাসীদের জিজ্ঞেস করবে) কী অপরাধ তোমাদেরকে আজ আগুনে ঢুকিয়েছে? উত্তরে তারা বলবে-আমরা নামায পড়তাম না, আর মিসকীনকে খাবার দিতাম না।” (সূরা ৭৪; মুদ্দাসছির ৪২-৪৪)

৩. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

“তারা ঈমান আনেনি, নামাযও পড়েনি। বরং উল্টো তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং (ঈমান থেকে) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।অহংকারের সাথে বাড়ি ফিরে

গিয়েছে, পরিবারপরিজনের কাছে।(অতএব, হে বেঈমান, হে বে-নামাযী!) তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ!

আবারও বলছি, তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ! মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়া) এমনিই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে?" (সূরা ৭৫; কিয়ামাহ ৩১-৩৬)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,

"(কিয়ামতের) দিন হাঁটুর নিম্নাংশ উন্মুক্ত করা হবে, আর (বেনামাযীদেরকে ডাকা হবে তাদের রবকে সিজদা করার জন্য। কিন্তু সেদিন তারা তা (শত চেষ্টা করলেও) পারবে না। তাদের দৃষ্টি থাকবে ভীত বিহ্বল এবং অবস্থা হবে অত্যন্ত অপমানজনক। (দুনিয়ার জীবনে যখন) তাদেরকে (নামাযের) সিজদার জন্য ডাকা হতো (তখন তা তারা করেনি)। অথচ তারা তখন ছিল সুস্থ (ও সক্ষম)। (সূরা ৬৮; কলম ৪২-৪৩) উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেন, আমাদের রব তাঁর পায়ের গোছা উন্মুক্ত করবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর-নারী তাকে সিজদা করবে।(কিন্তু বেনামাযীরা সেদিন তা পারবে না।)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যখন তাদের বলা হতো রুকু কর (অর্থাৎ নামায পড়) তখন তারা রুকু করত না (অর্থাৎ নামায পড়তো না) সত্যকে যারা মিথ্যা বলতো ঐসব লোকদের জন্য ধ্বংস।" (সূরা ৭৭; মুরসালাত ৪৮)। যারা এ যিকির (সালাত আদায় করবে না তাদের জীবন হবে সংকুচিত (কঠিন) এবং কিয়ামতের দিন হাশরে উঠবে তারা অন্ধ অবস্থায়।

“(হ্যা,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাজির করবো।” (সূরা ২০; ত্বা-হা ১২৪)

হাশরের ময়দানে যেসব বেনামাজি অপমানিত হবে।দুনিয়াতে যারা যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে, পরকালে তারা আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর যারা দুনিয়াতে যথাযথভাবে নামাজ পড়বে না, লোক দেখানো কিংবা সুনাম লাভের আশায় নামাজ পড়তো তারা সে দিন সেজদা করতে পারবে না। বরং তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ٤٣

‘(স্মরণ কর) সেই চরম সংকটময় কিয়ামত দিবসের কথা যেই দিন তাদেরকে আহবান করা হবে সেজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা। তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদের সেজদা করার আহ্বান করা হতো (কিন্তু তারা সেজদা করেনি)।’

— সুরা আল-কালাম : আয়াত ৪২-৪৩

বে-নামাযীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুঁশিয়ারী:

তাদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

৬. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "একজন মুসলমান ও শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায পরিত্যাগ করা। (অর্থাৎ নামায যে কেউ ছেড়ে দেয়, সে লোক আর কাফের মুশরিকের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না) (মুসলিম)

৭. অপর এক হাদীসে তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামায নিয়ে। যে ব্যক্তি এ নামায ছেড়ে দিল সে কুফরী করল (বা কাফের হয়ে গেল)।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

৮. "যে ব্যক্তি তার সালাত হেফাযত করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য থাকবে নূর, প্রমাণ ও নাজাত। আর যে ব্যক্তি তার সালাতের হেফাযত করবে না তার জন্য কোন নূর নেই, নাজাত নেই, মুক্তির জন্য তার পক্ষে কোন দলীল থাকবে না এবং কিয়ামতের দিন কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ (এসব কাফির মুশরিকদের) সাথে তার হাশর হবে।" (মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

বে নামাজি সম্পর্কে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের উক্তি:

৯. দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল ইসলামে তার জন্য আর কোন কিছুই রইল না।"

১০. তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন, "নবী (স)-এর সাহাবাগণ একমাত্র নামায তরক করা ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে উল্লেখ করেননি।" (তিরমিযী) অর্থাৎ নামাযই একমাত্র ইবাদত যা পরিত্যাগ করাকে তারা কুফরী বলে বর্ণনা করেছেন

পরিশেষে....

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে উপাসনার নিজস্ব পদ্ধতি থাকলেও নামাজের মতো এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই। নামাজির জন্য এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা আক্ষরিক অর্থেই সামগ্রিক এমন একটি ব্যায়াম, যার প্রভাব মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গের উপরে পড়ে এবং মানুষের প্রতিটি অঙ্গ নড়াচড়ার ফলে তার দেহে শক্তি সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি এর দ্বারা তার সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে।

ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলূসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কিরাত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ও রুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে নামাজ। এ কারণে নামাজ যেন মুসল্লিকে বলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না। তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করো না, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্য হবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছ, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। এরপরও যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। আর স্ববিরোধী কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্ স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে। - রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২

শুধু তাই নয়, নামাজ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের অনন্য হাতিয়ার।

সমাপ্ত